যুগান্তর

তারিখ 16 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড হসপিটাল

ডাক্তার হতে আর কত বছর লাগবে!

ভুক্তভোগী

যথেষ্ট 'কেয়ারে' পড়ানো হয় শিক্ষার্থীদের। আর পরীক্ষা নেয়া হয় আরও বেশি 'টেককেয়ারে'। কেননা এই পড়া যে সেই পড়া নয়, মানুষের জীবন রক্ষা করার জ্ঞানার্জন। অংকের উত্তর না মেলা মানে কেবল নম্বর কাটা নয়, একটি অথবা অসংখ্য মানুষের জীবন সংহারের কারণ হতে পারে যে কোনও ছোট্ট ভুল। তাই মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরদারি যথেষ্ট কড়া এবং যত্নসহ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এমনই কোনও মেডিকেল কলেজের নামে শিক্ষার্থীরাই অভিযোগ করে পড়ালেখা কিংবা পরীক্ষার চেয়ে আর সব নিয়মের বেড়াজাল বিভ্রান্ত করে পড়ুয়াদের জীবন, মেধা; তখন বিষয়টি সত্যই ভাবনার খোরক বৈকি? এমনই কিছু অভিযোগ করেছে মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড হসপিটালে পড়ুয়া হবু ডাক্তাররা। যার অন্যতম একটি, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রত্যেক ইয়ারে অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা দিতে হয় কোর্স বা ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার জন্য। অনেকটা এসএসসির আগে দেয়া টেস্ট পরীক্ষার মতোই। তবে পার্থক্য হচ্ছে, পরীক্ষা পাস-ফেল পড়ালেখার চাইতেও বেশি নির্ভর করে ক্লাস উপস্থিতির ওপর। প্রতি সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য সব ছাত্রীকেই অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ হতে হবে— ইয়ার ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য কলেজের নিয়ম অনুযায়ী এই শর্ত পূরণ করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায় অংশ নেয়ারও এটি প্রথম শর্ত। এই শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার্থীদের জানানো হয় পরীক্ষা শুরুর মাত্র একদিন আগে। শর্ত পূরণে ব্যর্থ ছাত্রীরা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই অংশ নিতে পারে না অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায়। অ্যাসেসমেন্টে অংশ না নেয়ায় সারা বছর পড়ালেখা করেও বসতে পারে না ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায়। ফলাফল— শুধু ক্লাস উপস্থিতির শর্ত পূরণ না হওয়ায় একটি বছর শিক্ষা জীবন থেকে স্রেফ নাই হয়ে যাওয়া। অথচ অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা হয় ইয়ার ফাইনালের ২ মাস আগে। এবং অসেসমেন্টে কাম্য ক্লাস উপস্থিতি না থাকার কারণে পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্রীরা এই ২ মাস ক্লাস করলেও পারে না মূল পরীক্ষায় অংশ নিতে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্টে অংশ নেয়নি যে। নিয়ম বলে কথা!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজগুলোতে এমবিবিএস পেশাগত পরীক্ষা দেয়ার জন্য শতকরা ৭৫ ভাগ ক্লাস উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু এই মেডিকেল কলেজে অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যই চাই ৭৫ ভাগ ক্লাস উপস্থিতি। গড় হিসাবে ক্লাসে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি হয়েছে কি-না তা কেন শিক্ষার্থী আগে জানতে বা বুঝতে পারবে না? কারণটাও বেশ! শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা গেল, মাঝে-মধ্যেই অনেক সিনিয়র শিক্ষক পার্সেন্টিস খাতা বা ক্লাশ রেজিষ্টার আনতে ভুলে যান। সে সময় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হিসাব রাখতে শাদা কাগজে নাম লিখে নেন ঠিকই, তবে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নাম লেখা সে শাদা কাগজও প্রায়ই হারিয়ে যায় কোনও অজ্ঞাত কারণে। ফলাফল? 'তুমি ক্লাসে আসনি'— শিক্ষকের একমাত্র উত্তর। এবং আরও একটি ইয়ার ড্রপ...

অনেক সময়ই তাই কোনও কোনও ইয়ারে মাত্র ২৫/২৬ জন শিক্ষার্থী অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনীত হয়। বাকিরা পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১/২ দিন আগে জানতে পারায় আর কিছুই করার থাকে না তাদের। 'ইয়ার লস' শিরোনাম কপালে সেঁটে পরের ব্যাচের সঙ্গে আবার নতুন করে পড়া শুরু।

> এমনও শিক্ষার্থী আছে যারা কেবল অনুপস্থিতির জন্য অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে না পারায় এক ইয়ার পাস করতে ২/৩ বছরও লাগিয়ে দিয়েছেন। এজন্য দিচ্ছেন নিয়মিত সেশন চার্জ, টিউশন ফি, হলের সিট রেন্টসহ যাবতীয় খরচ। উপরি হিসেবে আছে 'অনিয়মিত ও অকৃতকার্য' ছাত্রীর উপাধি।

অনেক কথার মধ্যে এটাই মুখ্য অভিযোগ হয়ে উঠেছিল এই কলেজের শিক্ষার্থীদের পাঠানো চিঠি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে। সঙ্গতকারণে ও তাদের অনুরোধে সেসব শিক্ষার্থীর নাম-সেশন অপ্রকাশিত থাকল

অ্যাসেসমেন্ট অংশ নিতে না পারায় যেসব ছাত্রীরা হয়ে যায় অনিয়মিত, তাদের অকৃতকার্য ছাত্রী হিসেবে নানান বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ জানাল ফাইনাল ইয়ার ও ফোর্থ ইয়ারের কয়েকজন। একই সঙ্গে আছে মানসিক চাপ। জানা গেল, অনেকসময় মোস্ট সিনিয়র শিক্ষকরা অনিয়মতি ছাত্রীদের বলেন, 'তোমরা বিয়েও করতে পার না?' কিংবা 'অপেক্ষা কর, তোমাদের নাতিদের সঙ্গে বেরোবে'। জুনিয়র স্টুডেন্টদের সামনে বিব্রত করা হয় সিনিয়র স্টুডেন্টদের। ছাত্রীরা শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সব মনযোগ ও সহযোগিতা কেবল নিয়মিত ছাত্রীরাই পায়। কর্তৃপক্ষের কথা মেনে ধরে নেই মেডিকেল কোর্স সমাপনে এরা অক্ষম। তাহলে এসব ছাত্রীকে বছরের পর বছর কলেজে রেখে কী লাভ? এভাবে বছরের পর বছর ঠেলে ঠেলে বানানো চিকিৎসকের হাতে পড়া রোগীর কী দশা হতে পারে?

এই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরে একজন শিক্ষার্থীর বেতন হওয়ার কথা (৩০০০ গুণ ৫ গুণ ১২)= ১লাখ ৮০ হাজার টাকা। সেখানে অ্যাসেসমেন্ট বা এমন সব অজুহাতের ফ্যারে পড়ে ইয়ারলস দেওয়ায় অনেক ছাত্রীদের শিক্ষা বছরের সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়তি ৫ বছর। পাঁচ লাখ টাকায় শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তখন খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকায়। শিক্ষার্থীদের পেছনে খরচ করার কোনও খাত প্রদর্শন না করে এবং কোনও জবাবদিহিতা ছাড়াই এই অর্থের সংগৃহীত হয় বলে জানাল শিক্ষার্থীরা। এভাবে অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি খরচ নেয়া হলেও বাড়তি কেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা নেই। যা আছে তা হল, নিয়মিতরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সব ক্লাস, প্রাকটিক্যাল, ওয়ার্ড করতে পারবে। আর অনিয়মিতরা মেডিকেল লেখাপড়ার একটি অন্যতম অংশ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকদের মর্জিমাফিক ক্লাস, আনুষঙ্গিক করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এ বিষয়ে জানিয়ে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কতা বলছে না কেন। উত্তরে জানা গেল আরেক ইতিহাস। কলেজে গত ১ বছর যাবৎ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ডা. মজিবুল হক। এর আগেও একই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এমনসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ছাত্রীরা আন্দোলন করেছিল। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. হক। তারপরও এতোদিন পর আবার কেন তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিবে দায়িত্বে এলেন এনিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন। একই সঙ্গে শঙ্কাও কাজ করছে সেসব ছাত্রীদের মনে, যারা এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এর আগে আন্দোলন করেছিল। কেননা আন্দোলন করা ছাত্রীদের মধ্যে কেবল শেষ বর্ষের সব পরীক্ষার্থীরাই একচাসে পাশ করে কলেজ ছাড়ে। বাকী অন্যান্য ইয়ারের বা বাচের ছাত্রীরা এখন পাশ করে বের হতে পারেনি। অভিযোগ আছে, এসব ছাত্রীদের অনেকেই কতৃপক্ষের কাছে কালো তালিকাভুক্ত হিসেবে বিভিন্ন অন্যায় এবং অযাচিত আচরণের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে তারপরও ডা. মজিবুল হক প্রসঙ্গে নিশ্চুপ কলেজ কতৃপক্ষ। কেননা কলেজ কতৃপক্ষের একজন সয়ং ডা. হক। কলেজ ট্রাস্টির তিন সদস্যের একজন সদস্য তিনি। কলেজের টিউটোরিয়াল টিচার নিয়োগ নিয়েও অব্যবস্থা ও দূর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। বর্ষিয়ান ও ক্ষমতাধর শিক্ষকরা তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে নিয়োগ দেন বলে জানা যায়।

এই কলেজের শিক্ষার্থীদের পাঠানো অভিযোগপত্র দেখে, কথা বলে রিপোর্ট করেছেন শিপলু কাওসার